বিজ্ঞান মানুষকে মারতে শেখালেও মরতে শেখাতে পারে না। এইজন্যই দর্শনের আবশ্যক। মানুষে সহজে দেহ-পিঞ্জর থেকে আত্মা-পাখিটিকে মুক্তি দিতে চায় না, কেননা, ভবিষ্যতে তার গতি কি হবে সেবিষয়ে সকলেই অজ্ঞ। আত্মার সঙ্গে বর্তমানে আমাদের সকলেরই পরিচয় আছে এবং তার ভবিষ্যৎ-অস্তিত্বের আশা আমরা সকলেই পোষণ করি। এর বেশি আমরা আর-কিছুই জানি নে। অপরপক্ষে, দার্শনিকেরা আত্মার ভূত-ভবিষ্যতের সকল খবরই জানেন। সুতরাং অমরত্বের আশাকে বিশ্বাসে পরিণত করবার ভার তাঁদের হাতে। এবং তাঁরাও তাঁদের কর্তব্যপালন করতে কখনও পশ্চাৎপদ হন নি। যুদ্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য অবশ্য মারা, মরা নয়; তবে হত্যা করতে গেলে হত হবার সম্ভাবনা আছে ব'লে দার্শনিকেরা এই সত্য আবিষ্কার করেছেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে দেহত্যাগ করলে আত্মা একলম্ফে স্বর্গারোহণ করে এবং সেদেশে উপস্থিত হওয়ামাত্র এত ভোগবিলাসের অধিকারী হয় যে, তা এ পৃথিবীর রাজরাজেশ্বরেরও কল্পনার অতীত। কিন্তু অধ্রুব ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বের লোভে ধ্রুব ত্যাগ করা সকলের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। সকাল-সকাল স্বর্গপ্রাপ্তির সম্বন্ধে যোদ্ধাদের তাদৃশ উৎসাহ না থাকায়, তাদের উৎসাহ-বর্ধনের জন্য সঙ্গেসঙ্গে নরকেরও ভয় দেখানো হয়। কিন্তু তাতেও যদি ফল না হয় তো সেনাপতিরা যুদ্ধ-পরাঙ্মুখ সৈনিকদের বধ করতে পারেন, এবিষয়েও দার্শনিক বিধি আছে। অর্থাৎ মৃত্যুভয় দেখিয়ে মানুষকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করতে হয়।

দুর্ভাগ্যবশত অত কাঁচা ওষুধ সকলের ধরে না। পৃথিবীতে এমন লোক দুর্লভ নয়, যাঁরা মানুষকে মারতে প্রস্তুত নন— স্বর্গের লোভেও নয়, নরকের ভয়েও নয়। এদের যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাবার উপযোগী দর্শনও আছে। যাঁরা নিজের স্বার্থের জন্য পরের ক্ষতি করতে প্রস্তুত নন, তাঁদের নিঃস্বার্থতার দিক দিয়ে বাগাতে হয়। যিনি মর্তরাজ্য কি স্বর্গরাজ্য কোনো রাজ্যই কামনা করেন না, তাঁকে নিষ্কাম হত্যা করবার উপদেশ দেওয়া হয়। হত্যা পাপ নয়, কারণ ও একটি কর্ম। কর্ম করাই ধর্ম, তার ফল কামনা করাই অধর্ম। হত্যা করা যে পাপ এ ভ্রান্তি শুধু তাদেরই হয় যারা আত্মার ভূত-ভবিষ্যতের বিষয় অজ্ঞ। আত্মা যখন অবিনশ্বর তখন কেউ কাউকে বধ করতে পারে না। দেহ আত্মার বসনমাত্র। সুতরাং প্রাণবধ করার অর্থ আত্মাকে পুরনো কাপড় ছাড়িয়ে নূতন কাপড় পরানো। অপরকে নূতন বস্ত্র দান করা যে পুণ্যকার্য সে তো সর্ববাদিসম্মত। মানুষ যদি তার ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য অতিক্রম ক'রে নিজের অমরত্ব অর্থাৎ দেবত্ব অনুভব করে, তা হলে নিষ্ফল হত্যা করতে তার আর-কোনো দ্বিধা হবে না। অপরকে বধ করবার সুফলটি নিজে ভোগ না করলেও

আর-দশজনকে যে তার কুফল ভোগ করতে হয় তা উপেক্ষা করা কর্তব্য। পরদুঃখ-কাতরতা প্রভৃতি হৃদয়দৌর্বল্য হতে আত্মজ্ঞানী পুরুষ চিরমুক্ত। অতএব নির্মমভাবে যুদ্ধ কর।

পূর্বোক্ত বৈজ্ঞানিক মত বিদেশের এবং দার্শনিক মত এদেশের। বলা বাহুল্য যে, দুই একই-মতের এ-পিঠ আর ও-পিঠ।

এইসব দর্শনবিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে, যুদ্ধ-করাটা মানবধর্ম নয়। যদি তা হত তো মানবকে হয় দানব, নয় দেবতা, নয় পশু প্রমাণ করতে দর্শনবিজ্ঞানের সিংহব্যাঘ্রেরা এতটা গর্জন করতেন না।

আসল কথা, বুদ্ধি-ব্যবসায়ীরা মানবসমাজকে মাথার উপর দাঁড় করাতে চান, কাজেই তা উলটে পড়ে।

এসকল দর্শনবিজ্ঞান যে মনের বিকারের লক্ষণ তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। জ্বরে মাথায় খুন চড়ে গেলে মানুষে যে প্রলাপ বকে তার পরিচয় এই ম্যালেরিয়ার দেশে আমরা নিত্যই পাই। দুঃখের বিষয়, এই যুদ্ধ-জ্বর যেমন মারাত্মক তেমনি সংক্রামক। এ হচ্ছে মনের প্লেগ। এ যুগে শরীরের প্লেগ হয় এশিয়ায় আর মনের প্লেগ হয় ইউরোপে— এ দুয়ের ভিতর এই যা প্রভেদ। ইউরোপ বিজ্ঞানের বলে দেশ থেকে প্লেগ তাড়িয়েছে, মন থেকে কি তা তাড়াতে পারবে না?

এ পাপ দূর করতে যে মনের বল, যে চরিত্রের বল চাই, এককথায় যে বীরত্ব চাই— সে বীরত্ব তোমাদের নরসিংহ ও নরশার্দূলদের দেহে নেই। স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষ-চরিত্র অনুকরণ করা যে হাস্যকর তার কারণ মানবজাতি যদি যথার্থ সভ্য হতে চায় তো পুরুষের পক্ষে স্ত্রী-চরিত্রের অনুকরণ করা কর্তব্য। তোমাদের দেহের বলের সঙ্গে আমাদের মনের বলের, তোমাদের বুদ্ধিবলের সঙ্গে আমাদের চরিত্রবলের যদি রাসায়নিক যোগ হয় তা হলেই তোমরা যথার্থ বীরপুরুষ হবে, নচেৎ নয়। কারণ খাঁটি বীরত্বের ধর্ম হচ্ছে পরকে মারা নয়, বাঁচানো; পরের জন্য নিজে মরা নয়, বেঁচে থাকা। মানুষে ক্ষণিক নেশার ঝোঁকে পরের জন্য দেহত্যাগ করতে পারে, কিন্তু পরের জন্য চিরজীবন আত্মোৎসর্গ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রজ্ঞার আবশ্যক। সুতরাং যথার্থ নিষ্কাম ধর্ম হচ্ছে স্ত্রীধর্ম, ক্ষাত্রধর্ম নয়।

এর উত্তরে ঐতিহাসিক বলবেন, আজ তিন হাজার বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর ঢের বদল হয়েছে কিন্তু যুদ্ধ বরাবর সমানই চলে আসছে, সুতরাং তা চিরদিনই থাকবে। এর প্রত্যুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, পুরুষজাতির ভিতর যদি এমন-একটি আদিম

পশুত্ব থাকে যার উচ্ছেদ অসম্ভব, তা হলে তাদের লালনপালন করবার মত তাদের শাসন করবার ভারও আমাদের হাতে আসা উচিত। আমরা শাসনকর্ত্রী হলে পৃথিবীর যুদ্ধক্ষেত্রকে শ্রীক্ষেত্রে পরিণত করব এবং তোমাদের পোষ মানিয়ে জগবন্ধুর রথ টানাব। ইতি।

জনৈক বঙ্গনারী

কার্তিক ১৩২১

নারীর পত্রের উত্তর

আমরা স্ত্রীজাতিকে সমাজে স্বাধীনতা দিই নি, কিন্তু সাহিত্যে দিয়েছি। আজকাল বাংলাভাষায় লেখকের চাইতে লেখিকার সংখ্যাই বেশি। সম্ভবত সেই কারণে মাসিকপত্রসকল 'পত্রিকা'সংজ্ঞা ধারণ করেছে। স্ত্রীজাতি এতদিন সে স্বাধীনতার অপব্যবহার করেন নি; কেননা, মতামতে তাঁরা একালযাবৎ আমাদেরই অনুসরণ করে আসছেন। বাংলায় স্ত্রী-সাহিত্য জলমেশানো পুং-সাহিত্য বই আর কিছুই নয়, সুতরাং সে সাহিত্য পরিমাণে বেশি হলেও আমাদের সাহিত্যের চাইতেও ওজনে ঢের কম ছিল।

কিন্তু লেখিকারা যদি স্ত্রী-মনোভাব প্রকাশ করতে শুরু করেন, তা হলে তাঁদের কথা আর উপেক্ষা করা চলবে না। এই কারণে, এইসঙ্গে যে 'নারীর পত্র'খানি পাঠাচ্ছি, তার মতামত সম্বন্ধে সসংকোচে দুটি-একটি কথা বলতে চাই।

লেখিকার মূলকথার বিরুদ্ধে বিশেষ-কিছু বলবার নেই। সেকথা হচ্ছে এই যে, যুদ্ধ না-করা স্ত্রীজাতির পক্ষে স্বাভাবিক। এই স্বতঃসিদ্ধ সত্য প্রমাণ করবার জন্য অত বাগ্‌জাল বিস্তার করবার আবশ্যক ছিল না। অপরপক্ষে, যুদ্ধ করা যে পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক, তা প্রমাণ করাও অনাবশ্যক। এই সত্যটি মেনে নিলে লেখিকা দর্শন-বিজ্ঞানের প্রতি অত আক্রোশ প্রকাশ করতেন না। দর্শন-বিজ্ঞান যুদ্ধের সৃষ্টি করে নি, যুদ্ধই তদনুরূপ দর্শন-বিজ্ঞানের সৃষ্টি করেছে। ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র হচ্ছে ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠপোষক, তাই ব্রাহ্মণের শাস্ত্র ক্ষত্রিয়ের চিত্ততোষক হতে বাধ্য। এ দুই জাতির ভিতর স্পষ্ট সাংসারিক বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধ আছে; কিন্তু যুদ্ধজীবীর সঙ্গে বুদ্ধিজীবীর যে একটি মানসিক বাধ্যবাধকতাও আছে, তা সকলের কাছে তেমন সুস্পষ্ট নয়। একদল মানুষে যা করে, আর-এক দলে হয় তার ব্যাখ্যান নয় ব্যাখ্যা করে। কর্মবীর জ্ঞানহীন হতে পারে, এবং জ্ঞানবীর কর্মহীন হতে পারে; কিন্তু পৃথিবীতে কর্ম না থাকলে জ্ঞানও থাকত না। কর্ম জ্ঞানবৃক্ষের ফল নয়, জ্ঞান কর্মবৃক্ষের ফুল। সুতরাং যুদ্ধের দায়িত্ব দর্শনবিজ্ঞানের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে উধোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে চাপানো। মানুষ যতদিন যুদ্ধ করবে, মানুষে ততদিন হয় তার সমর্থন নয় তার প্রতিবাদ করবে। মানুষকে ঝগড়া-লড়াই করতে উসকে দেওয়াই যে জ্ঞানের একমাত্র কাজ, তা অবশ্য নয়। জ্ঞানীমাত্রেই যে নারদ নন, তার প্রমাণ স্বয়ং বুদ্ধদেব।

লেখিকা ধর্মযুদ্ধ এবং অধর্মযুদ্ধের পার্থক্য স্বচ্ছন্দচিত্তে মানতে চান না। তাঁর মতে এই 'অভেদ পার্থক্যে'র আবিষ্কারে পুরুষজাতি বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, হৃদয়ের নয়।

হৃদয় ও বুদ্ধির পার্থক্যও যে কাল্পনিক, এ সত্যটি মনে রাখলে যা আসলে অবিচ্ছেদ্য তার বিচ্ছেদ ঘটিয়ে তার এক অংশ আমাদের দিয়ে অপর অংশ স্ত্রীজাতি অধিকার করে বসতেন না। বুদ্ধিও আমাদের একচেটে নয়, হৃদয়ও ওঁদের একচেটে নয়; এবং যেমন হৃদয়ের অভাবের নাম বুদ্ধি নয়, তেমনি বুদ্ধির অভাবের নামও হৃদয় নয়। সুতরাং একথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, যুদ্ধের ধর্মাধর্মের বিচারে পুরুষজাতি বুদ্ধি ও হৃদয় দুয়েরই সমান পরিচয় দিয়েছেন। কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা কঠিন হলেও ধর্মক্ষেত্রে যুদ্ধ সম্বন্ধে বিধিনিষেধ মান্য।

'অহিংসা পরম ধর্ম'— এই বাক্য বৌদ্ধধর্মের মূলকথা হলেও বৌদ্ধশাস্ত্রেই স্বীকৃত হয়েছে যে, মানুষ পেটের দায়ে যুদ্ধ করে। উদরকে মস্তিষ্ক যে পুরোপুরি নিজের শাসনাধীন করতে পারে না, তার জন্য দায়ী মানুষের প্রকৃতি নয়, তার আকৃতি। দেহ ও মনে, কর্মে ও জ্ঞানে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়— তখন শান্তির জন্য একেও কিছু ছেড়ে দিতে হয়, ওকেও কিছু ছেড়ে দিতে হয়। হিংসা এবং অহিংসার সন্ধি থেকেই বৈধ হিংসার সৃষ্টি হয়। আর, সন্ধ্যা-জিনিসটি— তা সে প্রাতঃই হোক আর সায়ংই হোক— পুরো আলোও নয়, পুরো অন্ধকারও নয়। সুতরাং যুদ্ধ-জিনিসটি একদম সাদাও নয়, একদম কালোও নয়; ওই দুয়ে মিলে যা হয় তাই, অর্থাৎ ছাই।

লেখিকা আমাদের প্রতি— অর্থাৎ বাঙালি পুরুষের প্রতি— যে কটাক্ষ করেছেন, সে অবশ্য সে-জাতীয় বক্রদৃষ্টি নয় যার সম্বন্ধে কবিতা লিখে লিখে আমরা এলি নে। এসম্বন্ধে আমি কোনোরূপ উচ্চবাচ্য করব না; কেননা, লেখিকা স্বীকার করেছেন যে, রসনা হচ্ছে মহাস্ত্র। দুর্বল আমরা অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে জানি নে; কিন্তু অবলা ওঁরা যে ও-মহাস্ত্র ব্যবহার করতে জানেন— সেবিষয়ে কেউ আর সন্দেহ করেন না; কেননা, সকলেই ভুক্তভোগী।

সে যাই হোক, সাধারণ পুরুষজাতি সম্বন্ধে তাঁর মতের প্রতিবাদ করা যেতে পারে। তিনি পুরুষের স্বভাব অতি অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন; কেননা, তা স্ত্রীস্বভাব নয়। মানুষের স্বভাব যে কি, লেখিকা যদি তা জানেন তা হলে তিনি এমনি-একটি জিনিসের সন্ধান পেয়েছেন, যা আমরা যুগযুগান্তের অনুসন্ধানেও পাই নি। আমরা যেমন কোনো অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করে জন্মগ্রহণ করি নি তেমনি কোনো প্রাক্তন সংস্কার নিয়ে জন্মাই নি। আমরা দেহ ও মনের নগ্ন অবস্থাতেই পৃথিবীতে আসি। তাই আমরা মনুষ্যত্বের তত্ত্বের জন্য কখনো পশুর কাছে কখনো দেবতার কাছে যাই। কারণ এসব-জাতীয় জীবের একটা বাঁধাবাঁধি বিধিনির্দিষ্ট প্রকৃতি আছে; শুধু আমাদের নেই। আমরা শুধু স্বাধীন, বাদবাকি সৃষ্টি নিয়মের অধীন। সুতরাং আমরা মানবজীবনের

যখনই একটি বাঁধাবাঁধি নিয়মের আশ্রয় পেতে চাই, তখনই আমাদের মনুষ্যেতর জীবের দ্বারস্থ হতে হয়। নৃসিংহও আমাদের আদর্শ, নরহরিও আমাদের আদর্শ; শুধু আমরা আমাদের আদর্শ নই। মনুষ্যত্ব প'ড়ে-পাওয়া যায় না, কিন্তু গ'ড়ে-নিতে হয়— এই সত্য মানুষে যতদিন না গ্রাহ্য করবে, ততদিন ভিক্ষুকের মত তাকে পরের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হবে। যদি বল যে, প্রত্যক্ষ পশু কিংবা অপ্রত্যক্ষ দেবতা মানুষের আদর্শ হতে পারে না, তা হলে মানুষে উদ্ভিদকে তার আদর্শ করে তুলবে। এ কাজ মানুষে পূর্বে করেছে এবং বাধ্য হলে পরেও করবে। মানুষ যদি মানুষ না হতে শেখে, তা হলে উদ্ভিদ হওয়ার চাইতে তার পক্ষে পশু হওয়া ভালো; কেননা, পশু জঙ্গম আর উদ্ভিদ স্থাবর। মনুষ্যত্বকে স্থাবর করতে হলে মানুষকে জড় মূক অন্ধ ও বধির হতে হবে। আর তাছাড়া উদ্ভিদ হলে আমরা ভক্ষক না হই ভক্ষ্য হব।

লেখিকা যদি এখানে প্রশ্ন করেন যে, কোনো-একটা আদর্শ না পেলে কার সাহায্যে মানুষ একটি স্থায়ী মনুষ্যত্ব গড়ে তুলবে; তার উত্তরে আমি বলব, মানুষের মানুষকে নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করতে হবে। যেমন, আমরা একটা লেখা গড়ে তুলতে হলে যতক্ষণ আমাদের ক্ষমতার সীমায় না পৌঁছই ততক্ষণ ক্রমান্বয়ে কাটি আর লিখি; তেমনি সভ্যতা-পদার্থটিও ততক্ষণ বারবার ভেঙে গড়তে হবে, যতক্ষণ মানুষ তার ক্ষমতার সীমায় না পৌঁছয়। সেদিন যে কবে আসবে কেউ বলতে পারে না, সম্ভবত কখনোই আসবে না। রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি ধর্মনীতি দর্শন বিজ্ঞান যে পরিমাণে এই এক্সপেরিমেণ্টের কাজ করে, সে পরিমাণে তা সার্থক; এবং যে পরিমাণে তা নূতন এক্সপেরিমেণ্টকে বাধা দেয়, সে পরিমাণে তা অনর্থক। মানুষ সম্বন্ধে শেষকথা এই যে, তার সম্বন্ধে কোনো শেষকথা নেই।

সাধারণত যুদ্ধ-ব্যাপারটি উচিত কি অনুচিত, সে আলোচনার সার্থকতা যাই হোক, কোনো-একটি বিশেষ-যুদ্ধের ফলাফল কি হবে, সে বিচারের মূল্য মানুষের কাছে ঢের বেশি।

এই বর্তমান যুদ্ধই ধর-না কেন। পৃথিবীসুদ্ধ লোক এই ভেবে উদ্বেজিত উত্তেজিত এবং উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে যে, ইউরোপের হাতে-গড়া সভ্যতা এইবার ইউরোপ বুঝি নিজের হাতে ভাঙে। যদি ইউরোপের সভ্যতা এই ধাক্কায় কাৎ হয়ে পড়ে তো বুঝতে হবে যে, সে সভ্যতার ভিত অতি কাঁচা ছিল। তাই যদি প্রমাণ হয়, তা হলে ইউরোপকে এই ধ্বংসাবশেষ নিয়ে ভবিষ্যতে এর চাইতে পাকা সভ্যতা গড়তে হবে। ঠেকো দিয়ে রাখার চাইতে ঝাঁকিয়ে দেখা ভালো যে, যে-ঘরের নীচে আমরা মাথা রাখি সে-ঘরটি ঘুনে-খাওয়া কি টেঁকসই। কিন্তু এই ভূমিকম্পে যে ইউরোপের

অট্টালিকা একেবারে ধরাশায়ী হবে, সে আশঙ্কা করবার কোনো কারণ নেই। ধূলিসাৎ হবে শুধু তার দর্পের চূড়া, আর তার ঠেকো-দিয়ে-রাখা প্রাচীন অংশ, আর তার গোঁজামিলন-দিয়ে-তৈরি নতুন অংশ। এতে মানবজাতির লাভ বই লোকসান নেই। তাছাড়া এই যুদ্ধের ফলে ইউরোপের একটি মহা লাভ হবে— তার এই চৈতন্য হবে যে, সে এখনো পুরোপুরি সভ্য হয় নি। বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান হয়ে ইউরোপ আত্মজ্ঞান হারাতে বসেছিল; এই যুদ্ধের ফলে সে আবার আত্মপরিচয় লাভ করবে। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। লেখিকা বলেছেন যে, যুদ্ধরূপ মানসিক প্লেগ ইউরোপে আছে, এশিয়ায় নেই। এশিয়ার লোকের যে মনে পাপ নেই সেকথা বলা চলে না; কেননা, লেখিকাই দেখিয়েছেন যে, কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য উভয় শাস্ত্রই যুদ্ধ সম্বন্ধে একই মন্ত্র পুরুষজাতির কানে দিয়েছেন। তবে এশিয়া যে শান্ত আর ইউরোপ যে দুর্দান্ত, তার কারণ মন ছাড়া অন্যত্র খুঁজতে হবে। প্রাচ্যদর্শন শুধু মন্ত্র দিতে পারে, কিন্তু পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান শুধু মন্ত্র নয়, সেই মন্ত্রের সাধনোপযোগী যন্ত্রও মানুষের হাতে দিয়েছে। বিজ্ঞান মানুষের জন্য শুধু শাস্ত্র নয়, অস্ত্রশস্ত্রও গড়ে দিয়েছে। সে অস্ত্রের সাহায্যে মানুষে পঞ্চভূতকে নিজের বশীভূত করেছে, কিন্তু নিজেকে বশ করতে পারে নি। সুতরাং অনেকে মনে করতেন যে, বিজ্ঞান হয়তো অমানুষের হাতে খন্তা দিয়েছে। যদি এ যুদ্ধে প্রমাণ হয়ে যায় যে ঘটনাও তাই, তা হলে ইউরোপীয়েরা মানুষ হতে চেষ্টা করবে। কারণ ও খন্তা কেউ ত্যাগ করতে পারবে না; শুধু সেটিকে ভবিষ্যতে ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার না করে জড়প্রকৃতির শাসনের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে— অর্থাৎ প্রলয় নয়, সৃষ্টির কাজে তা নিয়োজিত হবে। এক্ষেত্রে বিশেষ করে ইউরোপের নাম উল্লেখ করবার অর্থ এই যে, এশিয়াবাসীদের কতদূর মনুষ্যত্ব আছে না-আছে— এ বৈজ্ঞানিক যুগে তার পরীক্ষা হয় নি। ও খন্তা হাতে পড়লে বোঝা যেত যে আমরা বাঁদর কি মানুষ।

এই যুদ্ধের বেদনা থেকে ইউরোপের ন্যায়-বুদ্ধি যে জাগ্রত হয়ে উঠবে, তার আর সন্দেহ নেই; কেননা, ইতিমধ্যেই সেদেশে মানুষে ত্রাহি-মধুসূদন বলে চীৎকার করছে, প্রহারেণ-ধনঞ্জয় বলে নয়।

কিন্তু পুরুষমানুষ যে কখনো মানুষ হবে— এ বিশ্বাস লেখিকার নেই। তিনি পুরুষকে ইতিহাসের অতিবিস্তৃত ক্ষেত্রে দাঁড় করিয়ে দেখিয়েছেন যে, সে কত ক্ষুদ্র। এবং ঐরূপে তার ক্ষুদ্রত্ব প্রমাণ ক'রে প্রস্তাব করেছেন যে, হয় সে স্ত্রীধর্ম অবলম্বন করুক, নয় তার শাসনের ভার স্ত্রীজাতির হাতে দেওয়া হোক। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি স্ত্রীধর্মী হওয়াই পুরুষের পক্ষে মনুষ্যত্বলাভের একমাত্র উপায় হয়, তা হলে